মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘর বার্তা

নবপর্যায় : ষষ্ঠ বর্ষ, দ্বিতীয় সংখ্যা, জুলাই ২০২৫

শরণার্থীদের সাথে সংহতি : ২৮ জুন ২০২৫

বিশ্ব শরণার্থী দিবসের আয়োজন

শরণার্থী শব্দটি মুক্তিযুদ্ধের অবিচ্ছেদ্য এবং বেদনাময় অংশ। তবে দুঃখজনকভাবে শরণার্থীরা মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক গবেষকদের আগ্রহের তালিকায় কম থাকেন। সম্প্রতি গবেষক কৌস্তুভ অধিকারী, নাজমুল ইসলাম ও মোহাম্মদ মাহবুবুর রহমান জালাল মুক্তিযুদ্ধকালীন বাংলাদেশী শরণার্থী শিবিরে মৃতের সংখ্যা বিষয়ে তাৎপর্যবহ গবেষণা সম্পন্ন করেছেন, যে গবেষণাপত্রটি একটি আন্তর্জাতিক পিআর রিভিউ জার্নালে প্রকাশিত হয়েছে। গত ২৮ জুন ২০২৫, মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘরের নিয়মিত আয়োজন বিশ্ব শরণার্থী দিবসের অনুষ্ঠানে গবেষকবৃন্দ তাদের গবেষণাপত্রটি উপস্থাপন করেন। আয়োজনের শুরুতে মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘরের ট্রাস্টি ডা. সারওয়ার আলী মনে করিয়ে দেন, শরণার্থীদের চেয়ে অসহায়, নিঃস্ব, হতভাগ্য মানুষ আর হয় না। তারা প্রাণভয়ে বসতবাটি, স্বজন-পরিজন, সারা জীবনের সঞ্চয় পরিত্যাগ করে দেশান্তরি হতে বাধ্য হয়। বিপরীতে যে অশুভ শক্তির ভয়ে ভীত হয়ে তারা উদ্বাস্তু হতে বাধ্য হয় তাদের থেকে ঘৃনিত শক্তিও পৃথিবীতে আর হতে পারে না। তিনি একাত্তরের স্মৃতিচারণ করে বলেন, সে সময়ে বাংলাদেশের এমন কোন গ্রাম বা শহর ছিল না, যেখান থেকে প্রাণভয়ে বা মুক্তিযুদ্ধে অংশগ্রহণের উদ্দেশ্যে মানুষ দেশত্যাগে বাধ্য হয়নি, এই দেশত্যাগী মানুষের সংখ্যা ছিল ১ কোটির অধিক, দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পরে এটি ছিল সর্বোচ্চ শরণার্থীর

৭-এর পৃষ্ঠায় দেখুন

জল্লাদখানা বধ্যভূমি স্মৃতিপীঠের অষ্টাদশ প্রতিষ্ঠাবার্ষিকী : ২১ জুন ২০২৫

মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘর পরিচালিত মিরপুরস্থ জল্লাদখানা বধ্যভূমি স্মৃতিপীঠ অষ্টাদশ বছর পূর্ণ করেছে। একাত্তরের শহিদদের নির্মম গণহত্যার স্মৃতি আঁকড়ে পার করেছে ১৮টি বছর। ২০০৭ সালের ২১ জুন যাত্রা শুরু করে জল্লাদখানা বধ্যভূমি স্মৃতিপীঠ। এই আঠারো বছরে দেশি-বিদেশি অগণিত দর্শনার্থী এবং শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের শিক্ষার্থীদের সামনে মুক্তিযুদ্ধের শহিদদের আত্মদানের স্মৃতি তুলে ধরেছে এ স্মৃতিপীঠ। অসংখ্য দর্শনার্থী -দের লেখা কান্না বিজড়িত মন্তব্য পড়লে বোঝা যায় জল্লাদখানার এই নিষ্ঠুর গণহত্যা কতটা ব্যথিত করেছে তাদেরকে। সেই সাথে বধ্যভূমি পরিদর্শনে মুক্তিযুদ্ধের চেতনায় উদ্বুদ্ধ হয়েছে নতুন প্রজন্মের শিক্ষার্থীরা। অষ্টাদশ প্রতিষ্ঠা বার্ষিকী উপলক্ষ্যে গত ২১ জুন ২০২৫ জল্লাদখানা স্মৃতিপীঠে পুষ্পার্ঘ্য অর্পণ করে শ্রদ্ধা নিবেদন ও স্মরণ করা হয় জল্লাদখানাসহ সারা দেশে নিহত সকল শহিদদের। অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘরের ট্রাস্টি গীতাঙ্ক দেবদীপ দত্ত, ব্যবস্থাপক (প্রশাসন) চন্দ্রজিৎ সিংহ, ব্যবস্থাপক (কর্মসূচি) রফিকুল ইসলাম এবং ব্যবস্থাপক (গবেষণা ও গ্রন্থাগার) ড. রেজিনা বেগম।

স্মৃতিচারণ করেন শহিদ আব্দুল হাকিম-এর পুত্র আব্দুল হামিদ। ১৯৭১ সালের ১১ এপ্রিল পাকিস্তান সেনাবাহিনীর হাতে নিহত হন তার বাবা।

বাবার মৃত্যুর সময় আব্দুল হামিদ-এর বয়স ছিল মাত্র ৩ বছর। বাবার শহিদ হওয়ার ঘটনা মা আমিরুন নেছা এবং বড় বোন আয়েশা খাতুনের কাছ থেকে শুনেছেন তিনি। জল্লাদখানা বধ্যভূমির রক্ষণাবেক্ষণের জন্য শহিদ পরিবারের পক্ষ থেকে মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘরের প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেন তিনি। শহিদ

৪-এর পৃষ্ঠায় দেখুন

গবেষণা পদ্ধতি কর্মশালা : ১৬ জুন ২০২৫

সেন্টার ফর দ্য স্টাডি অব জেনোসাইড অ্যান্ড জাস্টিসের উদ্যোগে, ১৬ জুন ২০২৫, মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘরের সেমিনার হলে অনুষ্ঠিত হলো গবেষণা-ভিত্তিক কর্মশালা Solving Problems in Research Together। কর্মশালায় বক্তা ছিলেন যুক্তরাষ্ট্রের টেম্পল বিশ্ববিদ্যালয়ের পলিটিক্যাল সায়েন্স বিভাগের পিএইচডি গবেষক ফারিহা আহমেদ।
এই কর্মশালার মূল উদ্দেশ্য ছিল গবেষণায় উদ্ভূত নানা সমস্যা চিহ্নিত করা এবং সেই সমস্যাগুলোর কার্যকর সমাধান নিয়ে যৌথভাবে চিন্তা করা। ফারিহা আহমেদ তার উপস্থাপনায় গুণগত গবেষণা পদ্ধতির বিভিন্ন দিক তুলে ধরেন। গবেষণা পদ্ধতির টেকনিক্যাল শব্দগুলোকে সরল ভাষায় ভেঙে তিনি বোঝান, গবেষণা মানেই শুধু তত্ত্ব নয় বরং সঠিক প্রশ্ন করা, উপযুক্ত তথ্য খোঁজা এবং সেই তথ্যের গভীরে যাওয়ার চর্চা।
তিনি যেমন ব্যাখ্যা করেন কীভাবে একটি 'কেস স্টাডি' নির্বাচন করতে হয়, তেমনি বোঝান 'প্রসেস ট্রেসিং'-এর মতো পদ্ধতি কীভাবে আমাদের একটি ঘটনার পেছনের কারণ খুঁজে পেতে সাহায্য করে। তিনি Most Similar Systems এবং Most Different Systems নামের দুটি কৌশলের কথা বলেন, যার মাধ্যমে গবেষকরা একাধিক ঘটনা বা প্রেক্ষাপট তুলনা করে বুঝতে পারেন, কেন এক জায়গায় এক রকম ফল হয়, আর অন্য জায়গায় ভিন্ন কিছু ঘটে।
গবেষণায় ইন্টারভিউ এর ভূমিকা নিয়েও আলোচনা হয়। তিনি বলেন, কাগজে লেখা তথ্য সবসময় যথেষ্ট নয়, কখনো কখনো মানুষের অভিজ্ঞতা, ভাবনা ও স্মৃতিও হয়ে ওঠে গুরুত্বপূর্ণ তথ্য। ইন্টারভিউ নেওয়ার সময় কীভাবে প্রশ্ন করতে হয়, কীভাবে বিশ্বাস অর্জন করতে হয়, এসব নিয়েও ব্যবহারিক কিছু পরামর্শ দেন তিনি।
আলোচনার মাঝে তিনি অংশগ্রহণকারীদের দুইটি দলে ভাগ করে দেন। প্রতিটি দল নিজেদের গবেষণা ধারণা অন্যদের সামনে উপস্থাপন করে এবং তারপর সবাই মিলে আলোচনা করে সেটি কীভাবে আরও পরিপূর্ণ করা যায়। ফারিহা নিজেও প্রত্যেক দলের সঙ্গে থেকে পরামর্শ দেন, কখনো কোনো আইডিয়াকে একটু ভেঙে চিন্তা করতে বলেন, আবার কখনো নতুন উৎস বা পদ্ধতির পরামর্শ দেন।
আলোচনার শেষ অংশে তিনি কিছু বাস্তব উদাহরণ ব্যবহার করে ব্যাখ্যা করেন, কীভাবে বিভিন্ন ধরনের প্রমাণ- যেমন সরকারি দলিল, সংবাদপত্রের রিপোর্ট, ব্যক্তিগত চিঠিপত্র বা সংরক্ষিত দলিল একটি গবেষণাকে সমৃদ্ধ করতে পারে। তবে তিনি একইসঙ্গে সাবধান করেন যে, আর্কাইভাল গবেষণায় তথ্য খণ্ডিত বা পক্ষপাতদুষ্ট হতে পারে, তাই সেইসব তথ্য যাচাই করাও জরুরি।
এই পুরো সময়জুড়ে কর্মশালার পরিবেশ ছিল প্রাণবন্ত ও আন্তরিক। প্রশ্ন উঠেছে, দ্বিধা প্রকাশ পেয়েছে, আবার সমাধানের পথও খোঁজা হয়েছে। সেন্টার ফর দ্য স্টাডি অব জেনোসাইড অ্যান্ড জাস্টিসের পক্ষ থেকে ভবিষ্যতেও এ রকম আয়োজন চলমান থাকবে- নতুন চিন্তা, নতুন দৃষ্টিভঙ্গি আর পরস্পরের সাথে শেখার সুযোগ তৈরির লক্ষ্যে।

অগ্নিজিতা দে সেঁজুতি
রিসার্চ এসিস্টেন্ট, সেন্টার ফর দ্য স্টাডি অব জেনোসাইড এন্ড জাস্টিস

রওশন-ফেরদৌস গার্লস স্কুল এন্ড কলেজ, চকোরিয়া

নতুন প্রজন্মের চোখে পর্বত অভিযান ও সুলতানার স্বপ্ন

স্বপ্ন দেখা মানুষের সহজাত প্রবৃত্তি, কেউ স্বপ্ন দেখে ঘুমিয়ে কেউ স্বপ্নের পথে এগিয়ে যেতে ঘুমাতে পারে না। সুলতানারা স্বপ্ন দেখে এগিয়ে যাবার, একা নয় চারপাশের সকল সুলতানাদের নিয়ে সামনের দিকে এগিয়ে যাবার। ১৯০৫ সালে রোকেয়া সাখাওয়াত হোসেন যে স্বপ্ন নিয়ে লিখেছিলেন Sultana's Dream সে স্বপ্ন বাস্তবায়নে গত ডিসেম্বরে মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘর ও পর্বতারোহী সংগঠন 'অভিযাত্রী' পঞ্চকন্যার হিমালয় অভিযান 'সুলতানার স্বপ্ন অবারিত' পরিচালনা করে।
বাংলাদেশের আনাচকানাচে থাকা মেয়েদের মধ্যে সুলতানার স্বপ্ন ছড়িয়ে দিতে গত ৫ জুলাই কক্সবাজার জেলার চকরিয়া উপজেলার কাকারা ইউনিয়নের রওশন-ফেরদৌস গার্লস স্কুল এন্ড কলেজে সুলতানার স্বপ্ন অবারিত নিয়ে একটি কার্যক্রমের আয়োজন করা হয়েছিল। মাতামুহুরি নদীর পাড়ে গড়ে ওঠা এই স্কুলটি ২০২০ সালে ফেরদৌস পরিবারের উদ্যোগে শুরু হয়েছিল। অবকাঠামোগতভাবে ছোট একটা স্কুল হলেও ছাত্রীদের মধ্যে নিয়মানুবর্তিতা, আগ্রহের কমতি নাই। বৈরী আবহাওয়া সত্ত্বেও ছাত্রীদের উপস্থিতি ছিল চোখে পড়ার মতো। সকাল ৯টায় কুচকাওয়াজ, রোভার স্যালুট ও ফুলেল শুভেচ্ছার মাধ্যমে পর্বতারোহী নিশাত মজুমদারসহ সকলকে বরণ করে নেয় ছাত্রীরা। আউটডোর এক্টিভিটি করার পরিকল্পনা থাকলেও বৃষ্টির কারণে ক্লাসরুমেই অনুষ্ঠানের মূল অংশ পরিচালনা করা হয়।
শিক্ষিকা প্রশিকা পালের নির্দেশনায় কুরআন ও গীতা পাঠ এবং জাতীয় সংগীত গেয়ে মূল অনুষ্ঠানের সূচনা ঘটে। শিক্ষার্থীরা 'পাখি হয়ে উড়বো, ফুল হয়ে ফুটবো'; 'আমরা করবো জয় একদিন' গান গেয়ে জানিয়ে দেয় তারাও সুলতানার মতো স্বপ্ন দেখে এগিয়ে যাবার। পিছিয়ে পড়ে থাকা এই জনপদের নারীদের নিয়ে কাজ করে যাবার প্রত্যয় ব্যক্ত করে প্রধান শিক্ষক তার স্বাগত বক্তব্য শেষ করেন এবং অনুষ্ঠানটি পরিচালনার জন্য অভিযাত্রীদের আমন্ত্রণ জানান।
অভিযাত্রীর পক্ষ থেকে অনুষ্ঠানটি সঞ্চালনা করার দায়িত্ব নেয় ইমাম হোসেন। মাতামুহুরী নদীর উৎপত্তি নিয়ে কথা বলতে গিয়ে যখনই

৬-এর পৃষ্ঠায় দেখুন

শহীদ বাকী স্মৃতি পাঠাগারে প্রাণবন্ত এক সকাল

আনিসুল হোসেন, *শহীদ বাকী স্মৃতি পাঠাগার*

হঠাৎ করেই মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘরের সম্মানিত ট্রাস্টি মফিদুল হক বললেন উনি শহীদ বাকী স্মৃতি পাঠাগারে আসতে আগ্রহী এবং আগামীকাল সকালেই। আমার পরম শ্রদ্ধেয় একজন ব্যক্তিত্ব, যার কথা আমি মুগ্ধ হয়ে শুনি, বললেন পাঠাগারে এসে নিরিবিলি আলাপ করবেন।

আমারও অনেক দিনের ইচ্ছে উনাকে একটি অনুষ্ঠানে নিয়ে আসবো একদিন। পাঠাগারের শনিবারের পাঠচক্রে গল্প করবেন, উনার কথা শুনবো সবাই মিলে। কিন্তু কিছুতেই মেলাতে পারছিলাম না। একটা বড় আয়োজন করার জন্য যে সময় দেয়া প্রয়োজন সেটা করার মতো মনোবল একদম নেই।

যদিও উনি চেয়েছিলেন শুধু পাঠাগার দেখবেন কিন্তু আমি এই সুযোগ কীভাবে মিস করি। অনেকদিন যাবৎ আমরা চেষ্টা করছিলাম একটা প্রবীণ কর্ণার হবে যার বিষয়ে আসলে ‘পল্লীমা সংসদ’-এর প্রতিষ্ঠাতা সভাপতি মু. হাফিজুর রহমান ময়না ভাই একদিন বলেছিলেন। থাকবে পাঠাগারের করিডোরে মুক্তিযুদ্ধের আলোকচিত্র দিয়ে বাংলাদেশের ইতিহাস বর্ণনা। উদ্বোধন করার জন্য একটি আয়োজন করা যাচ্ছিলো না। এই সুযোগটুকু কাজে লাগানোর এমন অসাধারণ সুযোগ কি হারানো যায়?

ঢাকা মহানগরীর বিভিন্ন পাঠাগারের বন্ধুদের বললাম। দনিয়া পাঠাগারের সভাপতি শাহনেওয়াজ ভাই বলা মাত্রই রাজি, একে একে সীমান্ত গ্রন্থাগারের সাধারণ সম্পাদক টোকন ভাই, গ্রন্থবিতানের সাধারণ সম্পাদক জহির ভাই এবং প্রিয় মানুষ সাংবাদিক ও পাঠাগার অন্তপ্রাণ আলীম ভাই যোগ দেবেন বললেন।

সন্ধ্যায় মনে হলো জাতীয় গ্রন্থকেন্দ্রের পরিচালক এই আয়োজনে না এলে পরিপূর্ণ হয় কীভাবে। কিন্তু আসতে বলাটাও বেশ বিব্রতকর এবং সেটা দুই পক্ষেই। জাতীয় গ্রন্থকেন্দ্রের সহকারী পরিচালক ইনামুল সাহেবকে বললাম। উনি জানালেন দেখি কথা বলে। অবশেষে জাতীয় গ্রন্থকেন্দ্রের পরিচালক আফসানা বেগমও আমাদের এই আয়োজনে যুক্ত হলেন। উদারমনা ও প্রগতিশীল মানুষ বুঝি এমনই হয়। কারণ এই পদে থাকা কারো এভাবে চলে আসা আমাদের দেশের রীতি নয়। বিষয়টি একটা নতুন বাংলাদেশের উদাহরণ হতে পারে।

রাত বারোটায় মফিদুল হককে মেসেজ দিলাম জাতীয় গ্রন্থকেন্দ্রের পরিচালক আসবেন। উনি ফোন করলেন। বললেন তারেক এটাতো অনুষ্ঠান হয়ে যাচ্ছে। আমিতো এরকম চাইনি। পাঠাগার দেখা আর কিছু কথা ছিলো। বললাম আপনি আসবেন সুতরাং সেটা কি নীরবে হতে পারে! এতো বড় আনন্দ সবাইকে নিয়ে করতে চাই।

একেবারেই প্রস্তুতি ছাড়া এক অগোছালো আয়োজন। ছিলো না কোনো ব্যানার, স্টেজ, কীভাবে উদ্বোধন করা হবে সেটাও। ফরিদ ভাই বিকেলে ব্যানারের জন্য বলেছিলেন, আমি বললাম পারবো না। রাত এগারোটায় মনে হলো প্রবীণ কর্ণারে অন্তত একটা সাইনবোর্ড না থাকলে কীভাবে হয়। জেম (জলছবির অধ্যক্ষ)-কে বললাম, সে হতাশ করেনি। বললো কখন লাগবে? আমি বললাম অবশ্যই সকাল এগারোটায়। রাতে ডিজাইন করলো। বললো দুটো উপায়, কালার প্রিন্ট করে অথবা ডিজিটাল প্রিন্টের দোকান যদি খোলে তবে। সকাল দশটায় ফরিদ ভাই সেটা ম্যানেজ করলেন। জেমকে বললাম এটা করতেই হবে এবং অবশেষে জেম পুরো আয়োজন রঙিন করে আনলো। ছেলেটাকে কখনোই না করতে দেখিনি আমি। ধন্যবাদ জেম।

শুরু থেকেই পুরো আয়োজনে উৎসাহ, সাহস যুগিয়েছেন লিটন ভাই (পল্লীমা সংসদের সভাপতি) আলী হায়দার ভাই (পল্লীমা সংসদের সাধারণ সম্পাদক)।

সকাল থেকেই বৃষ্টি। ভাবছিলাম আসবেতো সবাই! কথামতো ঠিক সকাল দশটায় চলে এলেন মফিদুল হক একদম পাঠাগারে। জানতে চাইলেন পাঠাগারের কার্যক্রম নিয়ে। শনিবারের পাঠচক্র খাতাটি দেখলেন। ‘সোফির জগৎ’ নিয়ে পাঠচক্র দেখে উচ্ছ্বসিত হলেন।

একে একে সবাই এসে হাজির। জাতীয় গ্রন্থকেন্দ্রের পরিচালক মনে হলো উড়ে চলে এলেন। কারণ উনি বলেছিলেন মিটিং আছে, দেরি হলে জানাতে, মিটিং শেষ করে আসবেন। এগারোটায় চলে যাওয়ার কথা বলছিলেন কিন্তু সেই এগারোটা শেষে দুপুর প্রায় একটা।

অবশেষে প্রাণবন্ত এক আয়োজন। সবাই মিলে আমার ব্যর্থতা এবং আয়োজনের অসঙ্গতিগুলো আড়াল করে একটি সফল উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে পরিণত করলেন। এসেছিলেন সেবা প্রকাশনী থেকে প্রকাশিত ওয়েস্টার্ন সিরিজের লেখক শওকত হোসেন। উনি বললেন আরও বই নিয়ে আসছি পাঠাগারে, ওর সংগ্রহের সব বই এখন শহীদ বাকী স্মৃতি পাঠাগারেই থাকবে। এটাই আমার গ্রন্থাগার।

ছোট আয়োজন কিন্তু কথা হলো অনেক বড় পরিকল্পনা এবং সম্ভাবনা নিয়ে। অনুষ্ঠান শেষে মফিদুল হক পাশে বসে বলছিলেন আর আমি ভাবছিলাম এই বয়সে এসেও নতুন করে স্বপ্ন দেখা! উনার স্বপ্ন রোকেয়ার ইচ্ছে পূরণ করে নারীদের উন্নয়ন, মেয়েরা হিমালয় অভিযানে যাবে নিশাত মজুমদারের মতো। হতাশ করতে ইচ্ছে হলো না। শুধু বললাম চেষ্টা করবো। কিন্তু জীবনের অনেক চাহিদা, এগুলোই পূরণ করতে পারছি না। বড্ড অবসন্ন লাগে এখন।

বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীদের মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘর পরিদর্শন

ঢাকা মহানগরীর বিভিন্ন শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের শিক্ষার্থীদের জাদুঘর পরিদর্শনের মধ্য দিয়ে ১৯৯৭ সাল থেকে আউটরিচ কর্মসূচির যাত্রা শুরু হয়। শিক্ষা কর্মসূচিতে বাদ যায়নি প্রতিবন্ধী ও সুবিধা বঞ্চিত শিশু, এসওএস শিশুপল্লী, ইউসেপ বাংলাদেশ এবং আহছানিয়া মিশনের শিক্ষার্থীরা। মাধ্যমিক স্কুল, কলেজ, মাদ্রাসা, ইংলিশ মিডিয়াম স্কুল ছাড়াও এই কর্মসূচিতে স্বায়ত্তশাসিত ও বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়গুলো যুক্ত হয়েছে।

বাংলাদেশের অভ্যুদয়ের ইতিহাস বিশ্ববিদ্যালয়ের পাঠ্যসূচিতে অন্তর্ভুক্ত হওয়ায় স্বায়ত্তশাসিত ও বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়গুলোও যুক্ত হচ্ছে আউটরিচ কর্মসূচিতে। ইতোমধ্যে ব্রাক ইউনিভার্সিটি, ইস্ট ওয়েস্ট, নর্থ সাউথ, ইউআইইউ, ইস্টার্ন ইউনিভার্সিটি, ইউএপি, আইইউবি, জেডআরএনএফ, ড্যাফোডিল, ইউল্যাব, এআইইউ, উত্তরা ইউনিভার্সিটি, স্টেট ইউনিভার্সিটি, বাংলাদেশ ইউনিভার্সিটি, নর্দান ইউনিভার্সিটি, ইউনিভার্সিটি অব অলটারনেটিভ ডেভেলপমেন্ট, শান্ত মারিয়াম ইউনিভার্সিটি, ওয়ার্ল্ড ইউনিভার্সিটি, দি মিলেনিয়াম, সেন্ট্রাল উইমেন্স ইউনিভার্সিটি, স্ট্যামফোর্ড ইউনিভার্সিটি, দি পিপলস ইউনিভার্সিটি, গ্রীন ইউনিভার্সিটি ও এশিয়ান ইউনিভার্সিটির শিক্ষার্থীরা মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘর পরিদর্শন করেছে। এছাড়া জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়, জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ইতিহাস বিভাগ এবং শাহজালাল বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয় (স্থাপত্য কলা বিভাগ) ও বাংলাদেশ প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীরা আউটরিচ কর্মসূচিতে যুক্ত হয়েছেন। যে সকল বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয় মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘর পরিদর্শনে এসেছে তাদের মধ্যে ইস্ট ওয়েস্ট ইউনিভার্সিটি, ইউনিভার্সিটি অব এশিয়া প্যাসিফিক ও ইউনাইটেড ইন্টারন্যাশনাল ইউনিভার্সিটির সাথে এমওইউ চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়েছে।

শহিদ পরিবারের স্মৃতিচারণ শুনছে শিক্ষার্থীরা

জল্লাদখানা বধ্যভূমি স্মৃতিপীঠের নিয়মিত আয়োজন শিক্ষার্থীদের সাথে শহীদ পরিবারের স্মৃতিচারণ। এর ধারাবাহিকতায় গত ১৯ জুন ২০২৫ ওয়েস্টার্ন প্রি-ক্যাডেট স্কুল (শেরে বাংলানগর)-এর চতুর্থ ও ৫ম শ্রেণির শিক্ষার্থীরা এবং ২৬ জুন ২০২৫ কাজী আবুল হোসেন হাইস্কুল, বাইশটেকী, মিরপুর ১৩-এর ৭ম থেকে নবম শ্রেণির শিক্ষার্থীরা স্মৃতিচারণ আয়োজনে অংশ নেয়। স্মৃতিচারণ করেন শহিদ নজরুল ইসলাম মল্লিকের ভাই ইকবাল মল্লিক। কাজী আবুল হোসেন স্কুলের নবম শ্রেণির ছাত্রী মোসা. তাহমিনা আক্তার বলেন, প্রায় সময়ই আমি এই রাস্তা দিয়ে চলাচল করতাম কিন্তু এই বধ্যভূমি সম্পর্কে আমার কোনো তথ্য জানা ছিলনা। এক সময়ে এ সকল বিষয় আমি পাঠ্যপুস্তকে পড়েছি কিন্তু আজ একজন শহিদ পরিবারের কাছ থেকে শুনে খুব মর্মাহত হয়েছি। আজ এখানে না এলে কখনো বুঝতে পারতাম না পাকিস্তানি হানদার বাহিনীরা কীভাবে আমাদের বাঙালিদের ওপর নির্মম অত্যাচার করেছে। সে সময় শহিদ হওয়া প্রত্যেকটি মানুষকে আমরা শ্রদ্ধা জানাই। তাঁদের উদ্দেশ্যে একটাই কথা বলবো– আমরা তোমাদের ভুলব না।

মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘরের মন্তব্য খাতা থেকে

মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘর ঘুরে মুক্তিযুদ্ধ সম্পর্কে অনেক ছবি এবং মুক্তিযোদ্ধাদের স্মৃতি বিজড়িত অনেক কিছু দেখতে পেরেছি। যতই দেখছি ততই শিহরিত হয়েছি। খুব ভালো লাগলো। বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাস সম্পর্কে জানার অন্যতম মাধ্যম মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘর। বাংলাদেশ আমার আবেগ! ভালোবাসি বাংলাদেশকে।

মো: আরিফ হোসেন, বরিশাল

সত্যি আজকে এখানে না এলে বুঝতে পারতাম না কতটুকু ত্যাগের বিনিময়ে আমরা স্বাধীনতা অর্জন করেছি। অন্তর থেকে শ্রদ্ধা জানাই সেই সকল আত্মত্যাগী মুক্তিযোদ্ধাদের ও আত্মত্যাগী তরুণদের। অমর হয়ে থাকুক শহিদদের স্মৃতি। অমর হয়ে থাকুক বাংলাদেশ।

মো: জাকারিয়া (সাগর)
৪ জুন ২০২৫

চারমাস বয়সী ছোট্ট রেহানার জীবন কাহিনী পড়ে চোখে পানি চলে এলো। আমি অনেক ছোট্ট। মুক্তিযুদ্ধ নিয়ে আমার ধারণা খুবই কম। এখানে এসে আমি অনেক কিছু জানতে পারলাম।

নামিরা, কুমিল্লা
১৮.০৬.২০২৫

আমি এই প্রথম মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘরে এলাম। আমার খুব ভালো লেগেছে। আমার সন্তানদের বাংলাদেশের ইতিহাস দেখালাম এবং জানালাম। সকল যোদ্ধাদের শ্রদ্ধা ও সালাম জানাই।

ইতি
আমেনা খাতুন, ভেড়ামারা, কুষ্টিয়া

মুক্তিযুদ্ধ ও বাংলাদেশ সম্পর্কে জানার জন্য প্রত্যেক বাংলাদেশীর একবার হলেও মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘর পরিদর্শন করা উচিত। ভবিষ্যৎ প্রজন্মের কাছে আমাদের সঠিক ইতিহাস তুলে ধরা প্রয়োজন।

আনিক
২১.০৬.২০২৫

যারা মুক্তিযুদ্ধের জন্য সর্বস্ব বিলিয়ে দিয়েছিল যেমন– কৃষক, শ্রমিক, জনতা, ছাত্র, খেটে খাওয়া দিনমজুর এ দেশের স্বাধীনর জন্য ত্যাগ করেছে অনেক কিছু তাদের সম্মান জানাই। তাদের আত্মার মাগফিরাত কামনা করি। তাদের পরিবারের প্রতি শ্রদ্ধা। অনেক প্রাণ-ত্যাগের বিনিময়ে অর্জিত এদেশ ভালো থাকুক এটাই প্রত্যাশা।

মো: হামিদুর রহমান খান

রিয়াদ ও আমি জাদুঘর ঘুরলাম। '৭১ সনের যুদ্ধের কথাই মনে পড়ল নিজ চোখে দেখা কত মানুষের কষ্ট। মানুষের হাঁটতে হাঁটতে ফুলে যেত পা। নিজ ফার্মেসিতে অনেক গুলি লাগা মানুষের চিকিৎসা করতেন আমার বাবা ডাক্তার রোস্তম আলী ভুইয়া। আজকে মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘর ঘুরে দেখে ভালো লাগছে।

সামছুননাহর
২৮.০৬.২০২৫

The museum is a reminder of our shared history and shared struggles. Simultaneously, it's a sharp reminder of how the people of Bangladesh; were abandoned by their own and too far too long. History is complex and shared histories more so. It was a history, so important to me as an Indian who likes the same food, looks similar and feels at same. It was a reminder, it is too carry to have history repeat and look the other way.

Thank you.

Maitreyi Misra
26/05/2025

জল্লাদখানা বধ্যভূমি স্মৃতিপীঠের অষ্টাদশ প্রতিষ্ঠাবার্ষিকী

প্রথম পৃষ্ঠার পর

পরিবারের সদস্যদের মধ্যে আরো উপস্থিত ছিলেন- শহিদ জহরজান বেগমের কন্যা রওশনারা বেগম এবং শহিদ তোরাব আলী পরিবারের সদস্যবৃন্দ।

সঙ্গীত পরিবেশনের মাধ্যমে শহিদদের প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদন করে জল্লাদ খানায় শহিদ পরিবার এবং শহিদ বীর মুক্তিযোদ্ধা পরিবারের তৃতীয় প্রজন্মের সন্তানদের নিয়ে গঠিত সাংস্কৃতিক সংগঠন বধ্যভূমির সন্তানদল। 'মুক্তির মন্দির সোপান তলে' এবং 'ধনধান্যে পুষ্পভরা আমাদের এই বসুন্ধরা' গান দুটি পরিবেশনার মধ্য দিয়ে সমাপ্ত হয় জল্লাদখানা বধ্যভূমির অষ্টাদশ প্রতিষ্ঠাবার্ষিকীর শ্রদ্ধাঞ্জলি আয়োজন।

প্রমিলা বিশ্বাস
সুপারভাইজার
জল্লাদখানা বধ্যভূমি স্মৃতিপীঠ

গবেষণাপত্রের সংক্ষিপ্ত অংশ

১৯৭১ সালের মুক্তিযুদ্ধে বাংলাদেশী শরণার্থীদের মৃতের সংখ্যা

সারাংশ:

১৯৭১ সালে পাকিস্তানি সেনাবাহিনীর দমন-পীড়ন থেকে বাঁচতে ৯.৯ মিলিয়ন (৯৯ লক্ষ) বাংলাদেশি শরণার্থী ভারতে আশ্রয় নেয়। এই শিবিরগুলোতে ওষুধ ও খাদ্য সরবরাহ এত বিপুল সংখ্যক শরণার্থীর চাহিদা পূরণের জন্য পর্যাপ্ত ছিল না। ফলে, এই শরণার্থী শিবিরগুলোর দুরবস্থার কারণে সেখানে মৃত্যুহার ছিল বাংলাদেশের শান্তিকালীন স্বাভাবিক মৃত্যুহারের চেয়ে অনেক বেশি।

মৃত্যুর সংখ্যা নিয়ে পূর্ববর্তী অনুমানসমূহ:

মুক্তিযুদ্ধের সময় ৭ কোটি বাংলাদেশি জনগণের মধ্যে মোট মৃত্যুর সংখ্যা নিয়ে পূর্বে বেশ কয়েকটি অনুমান করা হয়েছে। এই অনুমানগুলো নিম্ন সংখ্যার মধ্যে যেমন ৫০,০০০; ১,০০,০০০ এবং ৩,০০,০০০ থেকে শুরু করে উচ্চ সংখ্যা ৩০ লাখ পর্যন্ত বিস্তৃত। ৩০,০০,০০০ যা বাংলাদেশের পক্ষ থেকে প্রদত্ত সরকারিভাবে স্বীকৃত সংখ্যা। তবে, মুক্তিযুদ্ধে মৃত্যুর সংখ্যা নিয়ে বিশ্লেষণ সাধারণত সেই সময়ের হত্যা বা সহিংস মৃত্যুর

এক কলেরা মহামারীর সময় জনৈক ত্রাণকর্মী বলেন, "তারা এত সংখ্যায় মারা যাচ্ছে যে আমরা গুণেই উঠতে পারছি না"। ত্রিপুরার সাবরুমের কাছে একটি বড় শরণার্থী ক্যাম্পের পরিচালক এক সাক্ষাৎকারে বলেন, তার সবচেয়ে বড় চাহিদা ছিল একটি শ্মশান। মৃতদেহ পরিবহনের জন্য ট্রাক ভাড়া করা হয়েছিল।

মধ্যেই সীমাবদ্ধ থাকে। যুদ্ধবিধ্বস্ত জনগণের মধ্যে মহামারি বা অপুষ্টিজনিত মৃত্যুর ঘটনাগুলো প্রায়শই উপেক্ষিত হয়, যদিও বাস্তুচ্যুত জনগণের মধ্যে মৃত্যুহার সাধারণত শান্তিকালীন মৃত্যুহারের তুলনায় অনেক বেশি হয়। সেই সময়ের অনেক প্রতিবেদনে শরণার্থী ক্যাম্পগুলোর মৃত্যুহার অত্যন্ত ভয়াবহ বলে উল্লেখ করা হয়েছে। এক কলেরা মহামারীর সময় জনৈক ত্রাণকর্মী বলেন, "তারা এত সংখ্যায় মারা যাচ্ছে যে আমরা গুণেই উঠতে পারছি না"। ত্রিপুরার সাবরুমের কাছে একটি বড় শরণার্থী ক্যাম্পের পরিচালক এক সাক্ষাৎকারে বলেন, তার সবচেয়ে বড় চাহিদা ছিল একটি শ্মশান। মৃতদেহ পরিবহনের জন্য ট্রাক ভাড়া করা হয়েছিল।

শরণার্থীদের মধ্যে বিপুল সংখ্যক ঝুঁকিপূর্ণ জনগোষ্ঠী ছিল, বিশেষ করে শিশুরা, যারা সহজেই এই কঠিন পরিস্থিতির কাছে হার মেনে নিতো। ১৯৭১ সালের ২২ জুনের একটি সংবাদ প্রতিবেদনে মাঠপর্যায়ের কর্মীদের উদ্ধৃতি দিয়ে বলা হয়েছিল, "গত দুই মাসে, যখন পূর্ব পাকিস্তান থেকে ব্যাপক পালিয়ে যাওয়া শুরু হয়, তখন প্রায় ৩ লাখ মানুষ রোগে এবং আরও ৩ লাখ অপুষ্টিতে মারা গেছেন বলে অনুমান করা হচ্ছে"। সিম্যান সল্ট লেক ক্যাম্পের ৪,৭৭০ জন শরণার্থীর নমুনা জনগোষ্ঠীর ওপর জরিপ চালান এবং সেই তথ্যের ভিত্তিতে তিনি ২ লাখ মৃত্যুর একটি মোট অনুমানে উপনীত হন। কিন্তু সল্ট লেক ছিল একটি ভালো অবস্থার প্রদর্শনমূলক ক্যাম্প এবং ওই জরিপে কলেরার মতো মহামারীজনিত মৃত্যুর তথ্য অন্তর্ভুক্ত ছিল না। তাই সিম্যানের ২ লাখ মৃত্যুর হিসাব কেবল একটি প্রাথমিক নিম্নসীমা হিসেবেই ধরা যেতে পারে। উদাহরণস্বরূপ, ২৫ ডিসেম্বর ১৯৭১ সালের এক সংবাদ প্রতিবেদনে সিম্যান নিজেই বলেন যে, সল্ট লেক ক্যাম্পে আট বছরের নিচের প্রায় ৬,০০০ শিশু মারা গেছে, যেখানে মোট শরণার্থী-সংখ্যা ছিল ৩১,০০০; এই মৃত্যুহার পুরো শরণার্থী শিশুদের ক্ষেত্রে প্রয়োগ করলে দেখা যায়, আট বছরের নিচে শিশুদের মধ্যে প্রায় ৩ লাখ মৃত্যুর আশঙ্কা করা যায়। এই গবেষণাপত্রে আমরা দেখতে পাব, বর্ষা ও অ-বর্ষা মৌসুমে এবং বিভিন্ন ক্যাম্পে মৃত্যুহারে উল্লেখযোগ্য পার্থক্য ছিল। এই গবেষণায় ১৭টি বিভিন্ন শরণার্থী ক্যাম্পে মৃত্যুহারের তথ্য এবং বর্ষা ও অ-বর্ষা মৌসুমের ভিন্নতা বিবেচনা করে একাত্তরের যুদ্ধকালে বাংলাদেশী শরণার্থীদের মোট মৃত্যুর একটি সামগ্রিক অনুমান দাঁড় করিয়েছি।

উপকরণ ও পদ্ধতি

মৃত্যুহার নির্ধারণে ব্যবহৃত মডেল বাইনোমিয়াল বণ্টন মডেল:

ধরা হচ্ছে, একটি নির্দিষ্ট শরণার্থী ক্যাম্পে একজন শরণার্থীর দৈনিক মৃত্যুর সম্ভাবনা (মৃত্যুহার) হলো p, এবং সেই ক্যাম্পে সব শরণার্থীদের মোট ব্যক্তিসময় অবস্থানের পরিমাণ (person-time) হলো n। এখানে, q দ্বারা প্রতিদিন একজন শরণার্থীর জীবিত থাকার সম্ভাবনা বোঝানো হচ্ছে, অর্থাৎ $q = 1-p$।

এই ক্যাম্পে শরণার্থীদের মৃত্যুর সংখ্যা r হিসাব করতে আমরা বাইনোমিয়াল বণ্টন (Binomial distribution) ব্যবহার করব, যা সংখ্যাভিত্তিক তথ্য (count data) মডেলিংয়ে একটি প্রচলিত পদ্ধতি।

প্যারামিটারসমূহ

শরণার্থী ক্যাম্পগুলোর জন্য আমরা দুই ধরনের মৃত্যুহার বিবেচনা করছি। প্রথমটি হলো, সাধারণ বিভিন্ন কারণে সমস্ত শরণার্থীর মধ্যে প্রাকৃতিক মৃত্যুহার, যাকে b দ্বারা চিহ্নিত করা হয়েছে।

দ্বিতীয়টি হলো বর্ষাকালে মৃত্যুহারের বৃদ্ধি, যা মহামারি ও অন্যান্য কারণে ঘটে, যেটি শরণার্থী আগমন সংক্রান্ত অংশে বিশ্লেষণ করা হয়েছে। ১৯৭১ সালে ভারতের বর্ষাকাল ছিল জুন থেকে সেপ্টেম্বর পর্যন্ত। এই মৃত্যুহারকে m দ্বারা প্রকাশ করা হয়েছে। অতএব, বর্ষাকালে মোট মৃত্যুহার হবে $b+m$। উভয় মৃত্যুহারই ক্রুড ডেথ রেটের (CDR) এককেই মেনে নেওয়া হয়েছে, অর্থাৎ প্রতি মিলিয়ন মানুষের প্রতিদিনের মৃত্যুর সংখ্যা।

প্যারামিটার অনুমান

এই মডেলে b এবং m হল অজানা প্যারামিটার, যেগুলো একটি সমীকরণের সেট তৈরি করে এবং সেগুলো লিনিয়ার রিগ্রেশন-এর মাধ্যমে সমাধান করে অনুমান করা যায়। উদাহরণস্বরূপ, শুধুমাত্র সল্ট লেক ক্যাম্পে মোট জনসংখ্যা ছিল ১,৭০,০০০ এবং এর স্থায়িত্ব ছিল ১৫৩ দিন, ১ জুলাই থেকে ৩০ নভেম্বর পর্যন্ত। এটি মোট ব্যক্তি-সময়ের হিসাবে দাঁড়ায় ১,৭০,০০০× ১৫৩/১০,০০,০০০ = ২৬.০১ মিলিয়ন ব্যক্তি × দিন। এই শিবিরে, ২৬.০১ মিলিয়ন ব্যক্তি × দিন মৃত্যুহার b-এর জন্য উন্মুক্ত ছিল উক্ত সময়কালে এবং মোট মৃত্যুর সংখ্যা গণনায় ছিল ৩,৬৭১। অতএব, b-এর জন্য সমীকরণ দাঁড়ায়: ২৬.০১×b = ৩,৬৭১। এই সমীকরণ সমাধান করলে মৃত্যুহারের আনুমানিক মান দাঁড়ায় b = ৩,৬৭১/ ২৬.০১ = প্রতি মিলিয়নে প্রতি দিনে ১৪১.১৪ জনের মৃত্যু, অথবা প্রতি হাজারে প্রতি বছরে ৫১.৫২ জনের মৃত্যু। এই হার পূর্বে আলোচিত প্রাকৃতিক মৃত্যুহারের CDR এর চেয়ে উল্লেখযোগ্যভাবে বেশি, যা ছিল প্রতি মিলিয়নে প্রতি দিনে ৪৬.৫৭৫ জনের মৃত্যু, অথবা প্রতি হাজারে প্রতি বছরে ১৭ জনের মৃত্যু। অতএব, আমরা দেখতে পাই যে এমনকি 'আদর্শ' হিসেবে বিবেচিত সল্ট লেক শিবিরেও প্রাথমিক মৃত্যুহার প্রাকৃতিক মৃত্যুহারের তুলনায় উল্লেখযোগ্যভাবে বেশি ছিল।

পূর্ণাঙ্গ গবেষণাপত্র দেখতে স্ক্যান করুন

ফলাফল :

প্রতিদিন প্রতি এক মিলিয়ন মানুষের জন্য মৃত্যুহার ৪৬.৫৭৫ দ্বারা ভারতে অবস্থানকারী সমস্ত শরণার্থীদের মোট ব্যক্তি-সময় গুণ করলে, শরণার্থীদের মধ্যে স্বাভাবিক মৃত্যুর অনুমানিক সংখ্যা হয়: ১৮৫৩.৬৫×৪৬.৫৭৫ = ৮৬,৩৩৪.৪৬ জন। বাইনোমিয়াল মডেল অনুযায়ী, এই অনুমানের স্ট্যান্ডার্ড ডেভিয়েশন (SD) হলো: √৮৬,৩৩৪.৪৬ = ২৯৩.৮৩ জন মৃত্যু। ৯৫% কনফিডেন্স ইন্টারভ্যাল এর প্রস্থ হবে: ২×SD = ৯০৭.৯২ জন মৃত্যু। অতএব, শরণার্থীদের মধ্যে প্রাকৃতিক মৃত্যুর অনুমানিক সংখ্যার জন্য কনফিডেন্স ইন্টারভ্যাল হলো: (৮৫,৪২৬.৫৪, ৮৭,২৪২.৩৮) জন মৃত্যু।

মোট মৃত্যুর সংখ্যার অনুমান

ভিত্তিরেখা (baseline) মৃত্যুহার থেকে

৬-এর পৃষ্ঠায় দেখুন

১৯৭১ সালের যুদ্ধে বাংলাদেশি শরণার্থীদের মধ্যে মৃতের সংখ্যা

৫-এর পৃষ্ঠার পর

অনুমানকৃত মৃত্যুর সংখ্যা: ১৮৫৩.৬৫×১৭৪.০৩ = ৩২২,৫৮৪.৫০ জন। বর্ষাকালীন মৃত্যুহার বৃদ্ধির ফলে অতিরিক্ত মৃত্যুর অনুমানকৃত সংখ্যা: ৮৮৪.০৬×৩৬৯.৫১=৩২৬,৬৬৪.৯০ জন। সর্বমোট মৃত্যুর সংখ্যা: ৩২২,৫৮৪.৫০ + ৩২৬,৬৬৪.৯০ = ৬৪৯,২৪৯.৪০ জন। ১৯৭১ সালের ২৫শে ডিসেম্বর একটি সংবাদ প্রতিবেদনে বলা হয়, সল্ট লেক ক্যাম্পে মোট ৩১,০০০ জন জনসংখ্যার মধ্যে ৮ বছরের কম বয়সী ৬,০০০ শিশু মারা গেছে। এই অনুপাতে সমস্ত শরণার্থী শিশুদের মধ্যে মৃত্যুর সংখ্যা প্রায় ৩ লক্ষ হতে পারে। যখন প্রায় সমপরিমাণ বর্ষাজনিত মৃত্যুও এর সাথে যোগ করা হয়, তখন মোট মৃত্যুর অনুমান হয়: ৬৪৯,২৪৯ জন। এই অনুমানটিও ১৯৭১ সালের ২২ জুনে প্রকাশিত একটি সংবাদ প্রতিবেদন অনুযায়ী যথাযথ মনে হয় যেখানে বলা হয় যে, প্রায় ৩ লক্ষ মানুষ বিভিন্ন রোগে এবং সমপরিমাণ অপুষ্টিতে মারা গেছে, অর্থাৎ মোট মৃত্যুর সংখ্যা ২২ জুন অব্দি ৬ লক্ষে পৌঁছে গেছে, যখন মোট শরণার্থী সংখ্যা ছিল ৫ মিলিয়ন।

অতিরিক্ত মৃত্যুর সংখ্যার অনুমান :

শরণার্থীদের ভারতে অবস্থানের পুরো সময়কাল জুড়ে অনুমানকৃত মোট মৃত্যুর সংখ্যা ছিল: ৬৪৯,২৪৯.৪০ জন। একই সময়ে, শরণার্থীদের মধ্যে প্রাকৃতিক (স্বাভাবিক) মৃত্যুর সংখ্যা ছিল: ৮৬,৩৩৪.৪৬ জন। অতএব, এই সময়ে শরণার্থীদের মধ্যে অতিরিক্ত মৃত্যুর সংখ্যা ছিল: ৬৪৯,২৪৯.৪০-৮৬,৩৩৪.৪৬=৫৬২,৯১৫ জন। এখানে যে অতিরিক্ত মৃত্যুর সংখ্যা অনুমান করা হয়েছে, তা শরণার্থী জনসংখ্যার মধ্যে স্বাভাবিকের চেয়ে বেশি মৃত্যুহারের কারণে ঘটেছে।

কেন আমাদের মৃত্যুর সংখ্যার অনুমান সম্ভবত কম:

আমরা মৃত্যুর সংখ্যা নির্ধারণের প্রতিটি ধাপে রক্ষণশীল সিদ্ধান্ত নিয়েছি, যা এই অনুমানকে সম্ভবত একটি কম মূল্যায়ন করে তুলেছে। যেমন: (I) ভারত সরকারের অফিসিয়াল টেবিল অনুসরণ করে ২৫ মার্চ থেকে ১০ এপ্রিল সময়কালকে শরণার্থী আগমনের সময়ের মধ্যে অন্তর্ভুক্ত করা হয়নি, (II) প্রতিটি ক্যাম্পের জন্য পুরো সময়কালের গণনায় সর্বোচ্চ জনসংখ্যাকেই গাণিতিক ভিত্তি হিসেবে ধরা হয়েছে যদিও বাস্তবে সেই জনসংখ্যা কম ছিল অথবা (III) তথ্য অসম্পূর্ণ থাকায়, প্রতিটি ক্যাম্পের জন্য বিবেচিত সময়কালকে যতটা সম্ভব প্রসারিত করে ধরা হয়েছে। সংকট পরিস্থিতিতে, শরণার্থী ক্যাম্প থেকে সরকারি মৃত্যুর তথ্য প্রায়শই কম দেখানো হয় বা অসম্পূর্ণ থাকে। ১৯৭১ সালের ক্যাম্পগুলোতেও একই রকম পরিস্থিতি ছিল– যেটা বিভিন্ন পর্যবেক্ষক উল্লেখ করেছেন, এবং ধারণা করা হয়েছে যে অনেক মৃত্যু রেকর্ডে আসেনি।

- উত্তর-পূর্বাঞ্চলীয় রাজ্যগুলোর শরণার্থী ক্যাম্পে মৃত্যুহার সম্ভবত পশ্চিমবঙ্গের ক্যাম্পগুলোর তুলনায় বেশি ছিল।
- সল্ট লেক ছিল তুলনামূলকভাবে 'ভাল অবস্থার' একটি শরণার্থী ক্যাম্প।
- ক্যাম্পের বাইরে বসবাসকারী শরণার্থীদের মধ্যে মৃত্যুহার ছিল আরও বেশি।
- অপুষ্টিজনিত মৃত্যুর সংখ্যা সম্ভবত যথাযথভাবে গণনা করা হয়নি।
- ভারতে আসার পরে শরণার্থীদের মধ্যে জন্মসংক্রান্ত রেকর্ডের অভাব ছিল।
- ভারতে আসার পথে রাস্তায় যেসব শরণার্থীরা মারা গিয়েছেন, তাদের মৃত্যুর কোনো নথি রাখা হয়নি।
- বার্মায় শরণার্থীদের মধ্যে মৃত্যুহার ছিল আরও বেশি।

> **আনুমানিক ১ কোটি (১০ মিলিয়ন) শরণার্থীর মধ্যে ৫.৬ লাখ (০.৫৬ মিলিয়ন) অতিরিক্ত শরণার্থী মৃত্যুর আমাদের সংযতভাবে হিসাব করা অনুমানটি যুদ্ধকালীন সময়ে প্রায় ৭ কোটি (৭০ মিলিয়ন) জনসংখ্যার মধ্যে মোট মৃত্যুর সংখ্যা ০.৫, ১ বা ৩ লাখ (অর্থাৎ ০.০৫, ০.১ বা ০.৩ মিলিয়ন) বলে যে কমসংখ্যক অনুমান করা হয়েছে, তা নাকচ করে।**

গবেষণার সীমাবদ্ধতা :

এই গবেষণার প্রধান সীমাবদ্ধতা হলো তথ্যের উৎসের অভাব, যা মানবিক সংকট নিয়ে অধ্যয়নের একটি সাধারণ সমস্যা। ক্যাম্পের কর্মকর্তারা এবং কর্মীরা যখন শরণার্থীদের প্রয়োজনীয় সামগ্রী এবং চিকিৎসা পরিসেবা দেওয়ার জন্য লড়াই করছিলেন, তখন মৃত্যুর সঠিক রেকর্ড রাখা খুবই কম ঘটেছে। এই গবেষণায় ব্যবহৃত তথ্য তিনটি প্রধান ধরনের উৎস থেকে নেওয়া হয়েছে:

১. বিভিন্ন ক্যাম্পে পরিচালিত জরিপ,
২.ক্যাম্পগুলোর কার্যকালীন সংবাদ প্রতিবেদন,
৩. যুদ্ধের পর প্রকাশিত ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা বা সাক্ষাৎকার বিষয়ক প্রতিবেদন।

এছাড়াও, আমরা ১৯৭১-৭২ সালের জন্য UNHCR-এর মতো সংস্থার বই ও রিপোর্টের পাশাপাশি আন্তর্জাতিক সংবাদপত্রের ঐতিহাসিক আর্কাইভ (প্রোকুয়েস্ট ইত্যাদি মাধ্যমে) এবং ভারত ও বাংলাদেশের বিভিন্ন সংবাদপত্রের সংগ্রহ খুঁজে দেখেছি।

উপসংহার :

পশ্চিমবঙ্গ এবং উত্তর-পূর্ব রাজ্যের বিভিন্ন শরণার্থী শিবির থেকে মৃত্যুহার রিপোর্ট নিয়ে কাজ করে আমরা ১৯৭১ সালের যুদ্ধকালে ভারতীয় শরণার্থী শিবিরে অতিরিক্ত মৃত্যুহার ৫৬২,০০০-এরও বেশি হিসেবে অনুমান করেছি। তথ্যের বিশাল ভিন্নতার কারণে, আমাদের অতিরিক্ত মৃত্যুহারের বিশ্বাসযোগ্যতার মধ্যবর্তী সীমা তুলনামূলকভাবে বড়, যা ৩২৩,৫৬২ থেকে ৮০২,২৬৮ মৃত্যুর মধ্যে।

আমরা বলতে চাই যে, যুদ্ধকালীন মৃত্যুর যেকোনো অনুমানে এই শরণার্থী মৃত্যুর পরিসংখ্যান অন্তর্ভুক্ত করা উচিত, কারণ শরণার্থীরা যুদ্ধের সরাসরি পরিণতি ভোগ করেছেন, যদিও তারা সরাসরি যুদ্ধক্ষেত্রে অবস্থান করছিলেন না। মানবিক সংকটের মধ্যে, যেমন অভ্যন্তরীণভাবে বাস্তুচ্যুত ব্যক্তিরা এবং শরণার্থীদের মধ্যে অহিংস মৃত্যুহার প্রায়ই সহিংস মৃত্যুর চেয়ে বেশি হয়, এই সংখ্যাগুলোও বাস্তুচ্যুতির মূলে থাকা সংঘাতের সাথেও যুক্ত করা উচিত। অতএব, আনুমানিক ১ কোটি (১০ মিলিয়ন) শরণার্থীর মধ্যে ৫.৬ লাখ (০.৫৬ মিলিয়ন) অতিরিক্ত শরণার্থী মৃত্যুর আমাদের সংযতভাবে হিসাব করা অনুমানটি যুদ্ধকালীন সময়ে প্রায় ৭ কোটি (৭০ মিলিয়ন) জনসংখ্যার মধ্যে মোট মৃত্যুর সংখ্যা ০.৫, ১ বা ৩ লাখ (অর্থাৎ ০.০৫, ০.১ বা ০.৩ মিলিয়ন) বলে যে কমসংখ্যক অনুমান করা হয়েছে, তা নাকচ করে।

কৌস্তুভ অধিকারী/নাজমুল ইসলাম
মোহাম্মদ মাহবুবুর রহমান জলাল

নতুন প্রজন্মের চোখে পর্বত অভিযান ও সুলতানার স্বপ্ন

২-এর পৃষ্ঠার পর

পাহাড়ের কথা আসে শিক্ষার্থীরা ভীষণ উৎসাহ নিয়ে পাহাড়ে যাওয়ার ইচ্ছে পোষণ করে। পাহাড়ে চড়া, সাইকেলিং, দৌড়, সাঁতার নিয়ে সংক্ষিপ্ত কথা বলেন তিনি। অভিযাত্রী, মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘরের কর্মী ও সুলতানার স্বপ্ন অবারিত অভিযানের সদস্য ইয়াছমিন লিসা শিক্ষার্থীদের সাথে ভিডিওচিত্রসহ সম্প্রতি শেষ করে আসা মেরা পর্বত অভিযানের গল্প শোনান এবং শিক্ষার্থীদের মধ্যে সঠিক খাদ্যাভাস এবং শরীরচর্চার প্রয়োজনীয়তা সম্পর্কে কথা বলেন। তিনি বলেন শারীরিক সুস্থতা থাকলে মনের বাধা অতিক্রম করা সহজ হয়। নিয়মিত সুষম খাবার গ্রহণ করার কথা বলেন। অভিযাত্রী ও সুলতানার স্বপ্ন অবারিত অভিযানের সদস্য তাহুরা সুলতানা রেখা চট্টগ্রামের মেয়ে, আঞ্চলিক ভাষায় যখন শিক্ষার্থীদের উদ্দেশ্যে কথা বলতে শুরু করেন শিক্ষার্থীরা ভীষণ উপভোগ করে। রেখা তার পায়ে হেঁটে 'টেকনাফ থেকে তেঁতুলিয়া' অভিযানের গল্প শোনায়। প্রতিটি মানুষের মধ্যেই সম্ভাবনা আছে সেগুলো খুঁজে বের করে লক্ষ্যের দিকে এগিয়ে যাবার কথা বলেন। সুলতানার স্বপ্ন অবারিত অভিযানের ভিডিও চিত্র দেখানো শেষে অভিযাত্রী ইউছুফ 'স্বপ্ন' নিয়ে কথা বলেন। স্বপ্ন কি, মানুষ কেন স্বপ্ন দেখে, কীভাবে স্বপ্ন দেখবো, স্বপ্ন সত্যি করতে কি কি করতে হয় এ নিয়ে কথা বলেন। সর্বশেষ বাংলাদেশের প্রথম নারী এভারেস্ট আরোহী নিশাত মজুমদারের সাথে গল্পে মেতে ওঠে নতুন প্রজন্মের এই সুলতানারা। কীভাবে পাহাড়ে যেতে হয়, কী কী ভয় থাকে, এত সাহস পায় কীভাবে, প্রস্তুতির জন্য কী কী করে, পারিবারিক বাধা ছিল কিনা কৌতুহলী কিশোরীরা মনের সকল প্রশ্নের ডালা খুলে জানতে চায় তার কাছে। তুমি পারবে না, এই কথার জবাব কাজের মাধ্যমে দেখাতে হবে আমি পারি, আমরাও পারি। শিক্ষার্থীদের সকল প্রশ্নের উত্তর দেবার মধ্য দিয়ে অনুষ্ঠানের এই পর্যায়ের কার্যক্রম শেষ হয়। এরমধ্যে মেঘবৃষ্টি থেমে গেলে শিক্ষার্থীদের সাথে আউটডোর এক্টিভিটির বিভিন্ন উপকরণ যেমন তাঁবু, রোপ, হারনেস, ক্যারাবিনার ইত্যাদি দেখানো এবং ব্যবহারের কারণ জানানো হয়। অভিযাত্রী সাদাব ইয়াসির গাছের মধ্যে রোপ সেট করে পাহাড়ে কীভাবে এসেন্ডিং-ডিসেন্ডিং করতে হয় দেখায়। এই অংশটি শিক্ষার্থীরা ভীষণ উপভোগ করে। এই আয়োজনের স্মৃতি স্মরণ রাখতে শিক্ষকদের সাথে নিশাত মজুমদার ও অভিযাত্রীরা বেশকিছু গাছ রোপণ করেন। সর্বশেষ বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষকের কাছে মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘরের প্রতিনিধি ইয়াছমিন লিসা রোকেয়া সাখাওয়াত হোসেনের লেখা 'সুলতানার স্বপ্ন' বইটির ২৫ কপি তুলে দেন। শিক্ষকদের কাছে আহ্বান করা হয় শিক্ষার্থীদের বইগুলো পড়তে সুযোগ করে দেবার, বইটি পড়ে নিজেদের মতো করে লেখা, ছবি আঁকা, নাচ, গান, অভিনয়ের মাধ্যমে উপস্থাপন করার আয়োজন করা। শিক্ষার্থীরা ভীষণ আনন্দ নিয়ে পুরো আয়োজন উপভোগ করে। তারাও স্বপ্ন দেখে পাহাড়ে যাবার, লেখাপড়া করে নিজের স্বপ্ন পূরণ করার।

ইয়াছমিন লিসা
মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘর

বিশ্ব শরণার্থী দিবসের আয়োজন

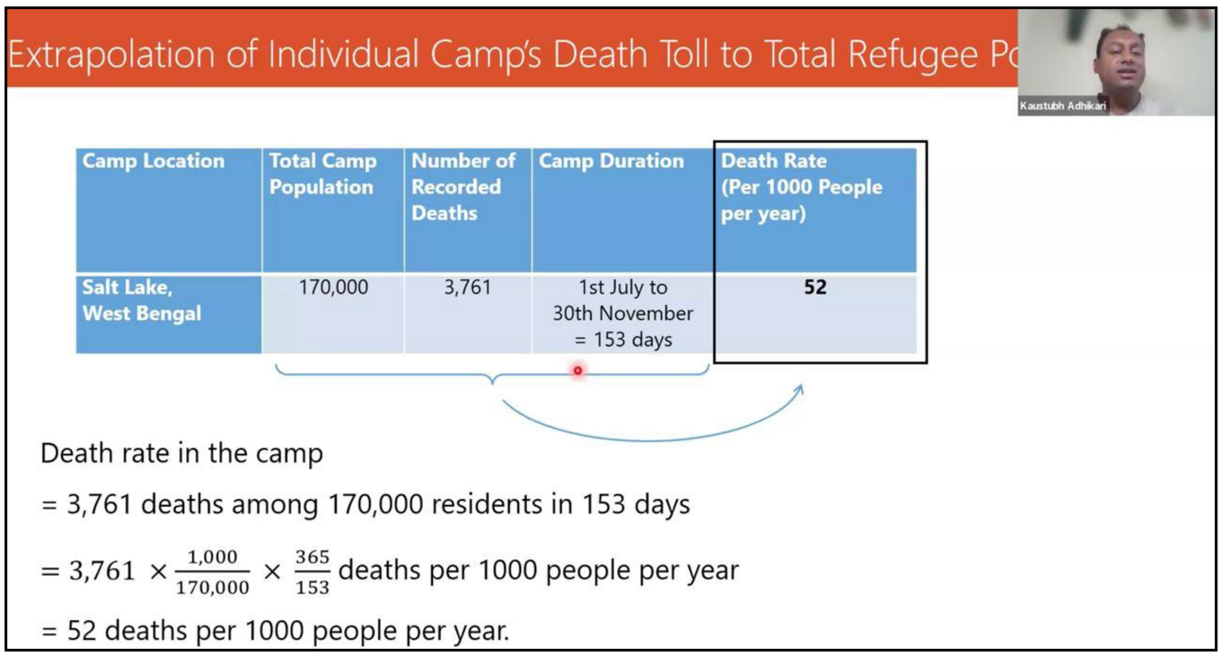

প্রথম পৃষ্ঠার পর

সংখ্যা। একই সাথে ডা. সারওয়ার আলী মনে করিয়ে দেন সেই সব মানুষদের কথা যারা অবরুদ্ধ বাংলাদেশে অবস্থান করে নিজেদের নিরাপত্তার স্বার্থে বারবার স্থান পরিবর্তন করেছেন, যাকে বলা হয় ইন্টারনাল মাইগ্রেশন। তিনি আহ্বান জানান এই ইতিহাস যেন কখনো আড়াল না হয়, এই ঘৃণিত শক্তিকে যেন কখনো ক্ষমা না করা হয়, ঘৃণা থেকে তারা যেন মুক্তি না পায়। তিনি বলেন, আজকে যখন শরণার্থী দিবস পালিত হচ্ছে, তখনও সারা বিশ্বে শরণার্থী রয়েছে। পাশের দেশ মায়ানমার থেকে নিঃস্ব, অসহায় রোহিঙ্গারা বাংলাদেশে আশ্রয় নিয়েছে, যদিও আশা করা গিয়েছিল, খুব দ্রুত তারা নিরাপদ ভেবে নিজেদের দেশে প্রত্যাবর্তন করবেন কিন্তু তেমনটি ঘটেনি। তিনি আশা প্রকাশ করেন একদিন শরণার্থী মুক্ত বিশ্ব তৈরি হবে যখন প্রাণভয়ে কেউ দেশত্যাগ করবে না।

'১৯৭১ সালের যুদ্ধে বাংলাদেশি শরণার্থী শিবিরে মৃত্যুসংখ্যা' শিরোনামে মূল গবেষণাপত্র উপস্থাপন করেন গবেষক নাজমুল ইসলাম এবং গবেষক কৌস্তুভ অধিকারী। তাদের গবেষণার মূল প্রতিপাদ্য শরণার্থী শিবিরগুলোর করুণ অবস্থা স্বাভাবিক সময়ে বাংলাদেশিদের মৃত্যুহারের তুলনায় অনেক বেশি মৃত্যু হারের কারণ হয়ে দাঁড়ায়। কারণ হিসেবে গবেষকবৃন্দ বলেন, শরণার্থী শিবিরগুলো বর্ষার দুর্যোগ ও কলেরার মতো মহামারিতে ভয়াবহভাবে আক্রান্ত হয়, একই সাথে শিবিরগুলোতে খাদ্য, ওষুধ ও অন্যান্য প্রয়োজনীয় সামগ্রীর সরবরাহ আশ্রয় নেয়া বিপুল সংখ্যক মানুষের জন্য যথেষ্ট ছিল না, ফলে কলেরা মহামারি, অপুষ্টি এবং যথ যথ চিকিৎসার অভাবে এই মৃত্যু ঘটে। এমন কি কোন কোন অঞ্চলে আশ্রয় নেয়া শরণার্থীর সংখ্যা সেখানকার স্থানীয় অধিবাসীদের সংখ্যাকে ছাপিয়ে যায়, ফলে ভারত সরকার এবং আন্তর্জাতিক মানবাধিকার সংস্থার জন্য পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণের বাইরে চলে যায়।

তারা ১৭টি ভিন্ন ভিন্ন শরণার্থী শিবিরে মৃত্যুর সংখ্যা এবং বর্ষা ও অ-বর্ষা মৌসুমের মৃত্যু হারের তারতম্য বিশ্লেষণ করে। যদিও এটি কঠিন একটি কাজ ছিল, কারণ ভারত সরকারের দলিলে শরণার্থীদের সংখ্যার যে হিসেব পাওয়া যায় তা আপেক্ষিকভাবে যথার্থ, কিন্তু শরণার্থী শিবিরগুলোতে মৃত্যু হারের কোন দলিল নেই। এমনটি ইউ এস সিনেট কমিটির একটি প্রতিবেদনে এও বলা হয় যে, প্রকৃত সংখ্যা নির্ধারণ করা খুব কঠিন এমনকি সম্ভাব্য সংখ্যা নির্ধারণ করাও। ফলে গবেষকবৃন্দ নির্ভর করেছেন প্রকাশিত বিভিন্ন জরিপ, সরকারি ভাষ্য ও পত্রিকায় পকাশিত প্রতিবেদনের ওপর। এক্ষেত্রে তারা সর্বনিম্ন হার নির্ধারণ করার চেষ্টা করেছেন যাতে প্রকৃত সংখ্যার অতিরিক্ত না হয়। গবেষণায় তারা দেখিয়েছেন যে ১ কোটি শরণার্থীর মধ্যে সাড়ে ৬ লাখ শরণার্থীর মৃত্যু ঘটে, স্বাভাবিক সময়ে এই সংখ্যা হতো ৮৬ হাজার। সুতরাং অতিরিক্ত ৫.৬ লাখ লোকের মৃত্যু ঘটে এই শরণার্থী সংকটের ফলে। তারা বলেন, মুক্তিযুদ্ধে মৃত্যুহার গণনার সময় কেবল সহিংসতায় মৃত্যুর ঘটনাকে বিবেচনায় নেয়া হয় কিন্তু সেটি ঠিক নয়, এর বাইরেও যারা এই যুদ্ধকালীন পরিস্থিতিতে নানা কারণে মৃত্যুবরণ করেছে তাদের হিসাবও বিবেচনায় নিতে হবে। কাজেই তাদের মতে যুদ্ধে মৃত্যুর যে কোন পরিসংখ্যানে এই শরণার্থীদের মৃত্যুসংখ্যা অবশ্যই অন্তর্ভুক্ত করতে হবে। এতে করে মুক্তিযুদ্ধে কত সংখ্যক মানুষ মারা গেছে এই পরিসংখ্যান দিতে গিয়ে যারা কম সংখ্যা নির্ধারণ করে তাদের পরিসংখ্যান সঠিক নয় বলে প্রমাণিত হবে।

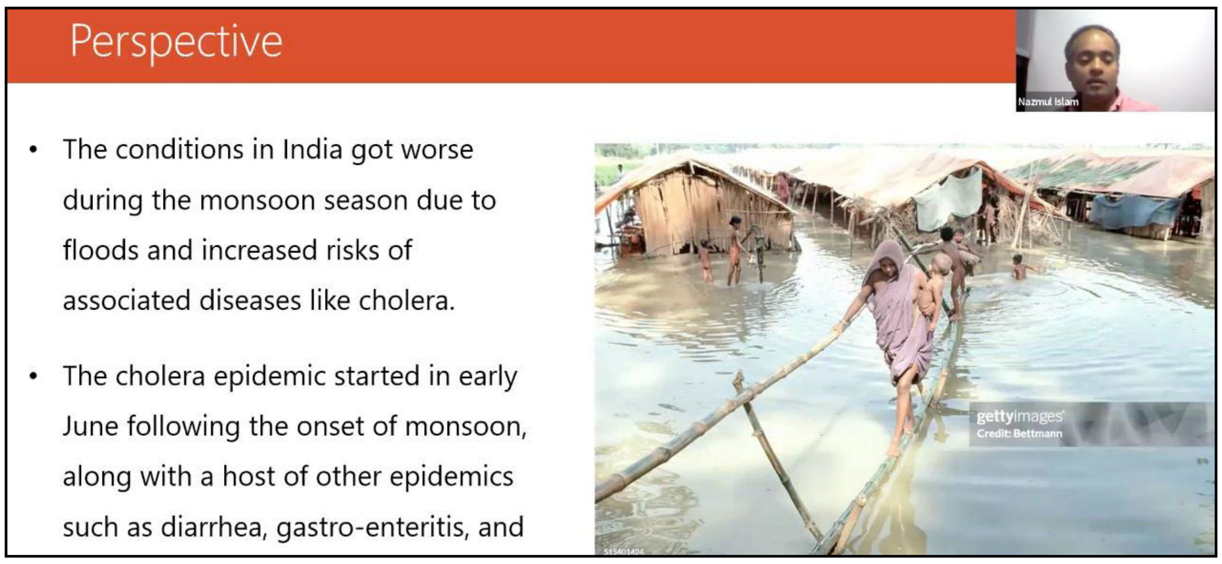

তারা উল্লেখ করেন যে, তাৎপর্যবহ এই গবেষণাপত্রটি প্রাথমিকভাবে দশ বছর পূর্বে মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘরের চতুর্থ জেনোসাইড কনফারেন্সে উপস্থাপন করেছিলেন। তারপর এবিষয়ে পূর্ণাঙ্গ গবেষণার প্রয়োজনিয়তা উপলব্ধি করেন। এ কাজে তাদের তৃতীয় সহ-গবেষক এম এম আর জালাল। দীর্ঘ দশ বছরের গবেষণাপত্রটি বর্তমানে একটি আন্তর্জাতিক ওপেন সোর্স পিআর রিভিউ জার্নালেও প্রকাশিত হয়েছে। গবেষকবৃন্দ আশা প্রকাশ করেন এ বিষয়ে ভবিষ্যতে গবেষকরা আরো অনুসন্ধান করবেন।

জাতিসংঘের শরণার্থী বিষয়ক হাই কমিশনের বাংলাদেশস্থ প্রতিনিধি মিজ জুলিয়েট মুরেকেইসনি শরণার্থীদের সাথে গভীর একাত্বতা বোধ করে বলেন, ভিন্ন সময়ে, ভিন্ন প্রেক্ষাপটে একই ঘটনার পুনরাবৃত্তি ঘটছে। ইউএনএইচসিআর একাত্তর সালে বাংলাদেশের শরণার্থীদের পাশে ছিল তারা স্বাধীন বাংলাদেশে ফিরে না আসা পর্যন্ত। তিনি মনে করেন বাংলাদেশ তার সেই দুঃসময়কে ভুলে যায়নি, যার প্রমাণ পাওয়া যায় কক্সবাজার আর ভাসানচরে বাস্তুচ্যুত রোহিঙ্গাদের আশ্রয় প্রদানের মধ্য দিয়ে। তার মতে সারা বিশ্বে ১২২ মিলিয়ন শরণার্থী রয়েছে, যাদের বাধ্য করা হয়েছে নিজভূমি থেকে উৎখাত হতে, যার প্রতিটি সংখ্যার পেছনে রয়েছে একটি নাম, একটি মুখ, একটি গল্প, হয়তো মা খুঁজে ফিরছেন সন্তানের জন্য নিরাপত্তা, রয়েছে একজন শিক্ষার্থীর শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে অধীর আগ্রহে ফেরার অপেক্ষার কথা, একটি পরিবারের পথ চাওয়া শান্তিপূর্ণ পরিবেশে আবার নিজেদের প্রতিষ্ঠা করার। তিনি মনে করেন, এবারের শরণার্থী দিবসের যে শ্লোগান 'শরণার্থীদের সাথে সংহতি' সেই সংহতি বা একাত্বতার মানে খোলা হৃদয় দিয়ে, মস্তিস্ক দিয়ে এদের কথা শোনা, শরণার্থীদের অধিকার রক্ষা করা, তাদের মর্যাদার সুরক্ষা নিশ্চিত করা। তিনি আহ্বান জানান, শরণার্থীদের আশ্রয় প্রদানকারী দেশ যেন সর্বোচ্চ সহযোগিতা পায় তা নিশ্চিত করতে। তিনি বলেন, শরণার্থীরা বোঝা নয়, তাদের অধিকার নিশ্চিত করতে পারলে তারাও যে কোন সমাজের সম্পদে পরিণত হতে পারে।

পরিশেষে মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘরের ট্রাস্টি ও সদস্য-সচিব মফিদুল হক মনে করেন, এখনই যথার্থ সময় এই বৈশ্বিক মানবিক সংকটের বিরুদ্ধে কার্যকর পদক্ষেপ গ্রহণের। তিনি বলেন, ১০ লাখের অধিক রোহিঙ্গা শরণার্থীকে আশ্রয় দেয়া বাংলাদেশও এই সংকটের অংশী। তারা আমাদের মনে করিয়ে দেয় একাত্তরকে, যখন ১ কোটি শরণার্থী অন্যভূমিতে আশ্রয় নিতে বাধ্য হয়েছিল, যাদের একাংশ মায়ানমারেও আশ্রয় নিয়েছিল। শরণার্থী সংকটকে বিশ শতকের এক বেদনাময় অধ্যায় উল্লেখ করে তিনি বলেন একুশ শতকেও এই সংকট চলমান রয়েছে। তিনি মনে করেন কেবল শরণার্থীদের দুর্দশা লাঘবই যথেষ্ট নয় বরং তাদের দুর্দশার মূল কারণ খুঁজে বের করে এর স্থায়ী সমাধান করতে হবে, এরজন্য আমাদের অতীতের দিকে ফিরে তাকাতে হবে, অতীত থেকে শিক্ষাগ্রহণ করতে হবে। তিনি শরণার্থী শিবিরে মৃত্যুর হার বিষয়ক তাৎপর্যবহ গবেষণার জন্য গবেষকদের অভিনন্দন জানান। তিনি উল্লেখ করেন, একাত্তরে বাংলাদেশে গণহত্যায় মৃত্যুর সংখ্যাকে যারা নিম্নমুখী করে দেখাতে চায় এই গবেষণা তাদের প্রচেষ্টার বিপরীতে সঠিক তথ্য দেয় এবং গণহত্যা ও যুদ্ধের পরিস্থিতিতে নিহতদের প্রতি ন্যায়বিচার করে। তিনি আশা প্রকাশ করেন প্রতিদিন আমরা যে নির্মমতা আর দুঃসহ ঘটনার সাক্ষী হচ্ছি, তার সমাধানে পুরো বিশ্ব এবং আন্তর্জাতিক সমাজ কার্যকর ভূমিকা গ্রহণ করবে এবং পৃথিবী শরণার্থীশূন্য হবে।

আয়োজনে মার্কিন কবি এ্যালেন গিনসবার্গের 'সেপ্টেম্বর অন যশোর রোড' কবিতাটি পাঠ করেন বুশরা আহমেদ তিথি এবং বাংলা অনুবাদ পাঠ করেন আশরাফুল হাসান বাবু।

মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘরের বিশেষ অতিথি

২৬ জুন ২০২৫ ব্লাস্টের অতিথি Connie Parker-Dhinakaran (Project Manager), Saul Lehrfreund (Executive Director), Maitreyi Misra, Nalsar University of Law, Mahbubur Rahman Iran, Monitoring & Reporting Coordinator মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘর পরিদর্শন করেন।

২৬ জুন ২০২৫ স্যাভরনের অতিথি Mr. Javier La Rosa, President, Base Assets and Emerging, ountries (BAEC), Chevron; Mr. Eric Walker, President & Managing Director, Chevron Bangladesh; Mr. Muhammad Imrul Kabir, Director, Corporate Affairs, Chevron Bangladesh; Mr. Shaikh Jahidur Rahman, Media & Communications Manager, Chevron Bangladesh মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘর পরিদর্শন করেন।

আন্তর্জাতিক গণমাধ্যমে বাংলাদেশের শরণার্থী সংকট

১৯৭১ সালের জুন-জুলাই মাসে শরণার্থী সংকট ভয়াবহ রূপ ধারণ করে। এই সংকট বিশ্ব-দরবারের দৃষ্টি আকর্ষণ করে। আন্তর্জাতিক গণমাধ্যম তুলে ধরে শরণার্থীদের করুণ চিত্র যা বাংলাদেশের পক্ষে জনমত তৈরিতে সহায়তা করে।

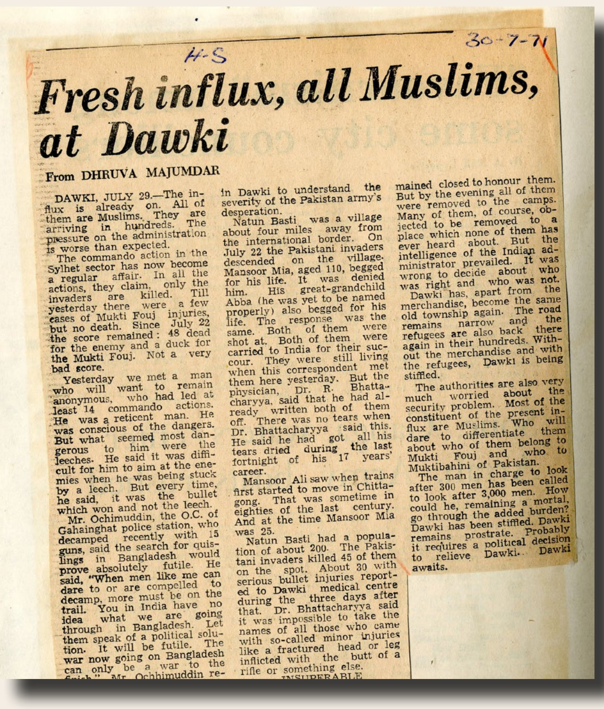

H-S 30-7-71

Fresh influx, all Muslims, at Dawki

From DHRUVA MAJUMDAR

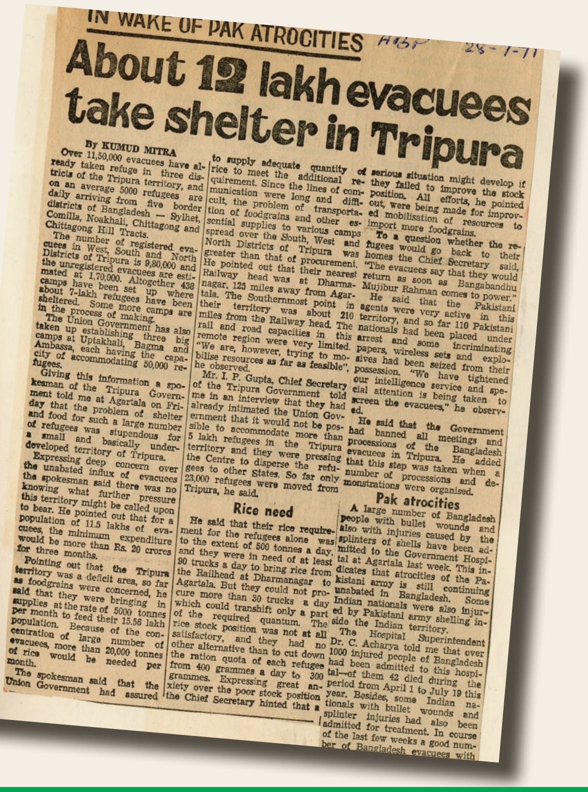

IN WAKE OF PAK ATROCITIES

About 12 lakh evacuees take shelter in Tripura

By KUMUD MITRA

Rice need

Pak atrocities

Disorder

A woman from Bangla Desh who lost her kith and kin the genocide

Cooked rice being distributed to Evacuees from East Bengal at th

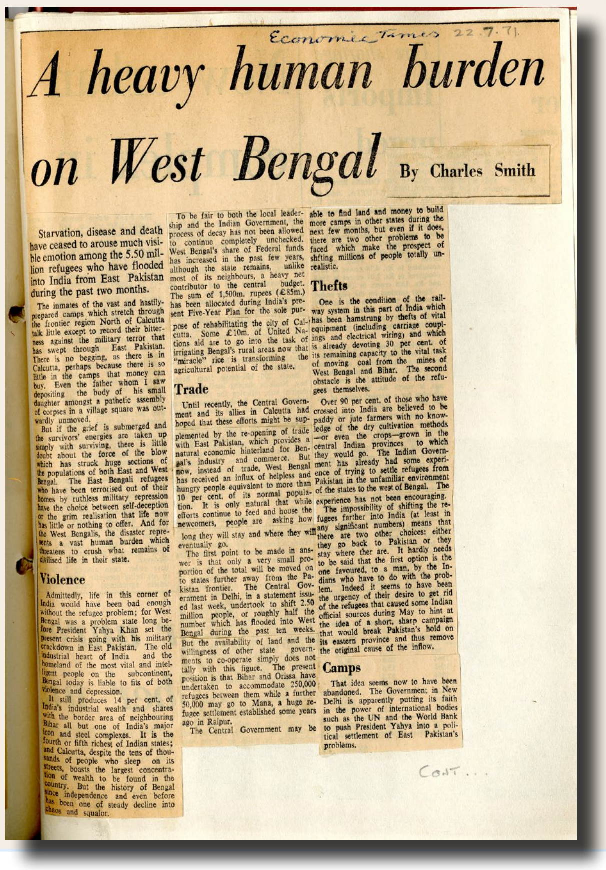

Economic Times 22-7-71

A heavy human burden on West Bengal

By Charles Smith

Thefts

Trade

Violence

Camps

আবেদনপত্র আহ্বান

সেন্টার ফর দা স্টাডি অব জেনোসাইড অ্যান্ড জাস্টিস আয়োজিত আগামী ২২ আগস্ট থেকে ১৯ সেপ্টেম্বর ২০২৫ অনুষ্ঠিতব্য মাসব্যাপী ১৪তম জেনোসাইড এন্ড জাস্টিস বিষয়ক সার্টিফিকেট কোর্সে অংশ গ্রহণের জন্য আবেদনপত্র আহ্বান করা হচ্ছে।

- আগ্রহী প্রার্থীদের ২৩ জুলাই ২০২৫-এর মধ্যে আবেদনপত্র জমা দিতে হবে।
- প্রতি শুক্র ও শনিবার ক্লাস অনুষ্ঠিত হবে।
- নির্বাচিত ৪০জন প্রার্থী কোর্সে অংশগ্রহণ করতে পারবেন।

আবেদন ফরম :

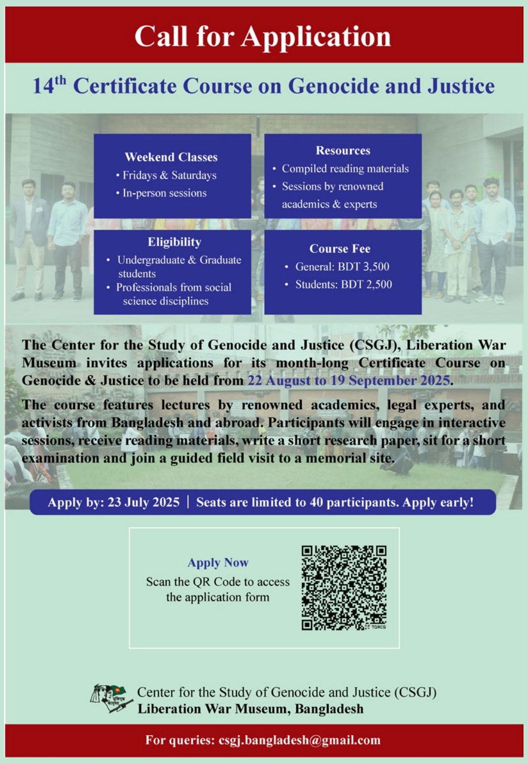

মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘরের পক্ষে **মফিদুল হক**, ট্রাস্টি ও সদস্য-সচিব, এফ-১১/এ-বি, সিভিক সেক্টর, আগারগাঁও, শেরে বাংলা নগর, ঢাকা-১২০৭ থেকে প্রকাশিত। সম্পাদক : ড. রেজিনা বেগম
গ্রাফিক্স ডিজাইন : এম আর ইসলাম। ফোন : ৮৮ ০২ ৪৮১১৪৯৯১-৩, ই-মেইল : mukti.jadughar@gmail.com
Web : www.liberationwarmuseumbd.org, Facebook : facebook.com/liberationwarmuseum.official